Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 117-123
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নবনাট্যের ধারায় 'নীলরক্ত' ও 'নীলকণ্ঠ' : নাটক

শেলী দত্ত
গবেষিকা (পি.এইচ.ডি), বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম

Abstract

The year 1945 was the phase of transition in the history of Bengali Drama. At that time, the blazing glory of the 'Mid-day sun' of the Nabanatya Andolma, i.e, New Theatre Movement, radiated the entire thespian domain of the then Bengal. The play tilled 'Nabanna' epitomized this new trend of drama. In fact, these prominent personalities who had earlier joined the People 'Theatre Group, i.e, Gananatya, were very talented persons although they failed to project the creative faculty successfully after joining Gananatya. Hence, they started their new journey towards a different route- they left the route Gananatya and organized the new theatre movement called Nabanatya, which maintained the tradition of Gananatya in fact, while at same time they made the people live afresh with a newer life-blood. Again, their new dramaturgical thinking also painted out for the two unique dramaturgical creations, i.e, 'Nil Rakta' and 'Nilkantha'. This discussion in question has ventured to observe the status of both these plays along with the evaluation of Bengali theatre.

Key words: History of Drama, Nabanatya (New Theatre Movement), Humanism. Optimism, Human Rights, Thespian Spirit.

ভারত স্বাধীনতার প্রাক কালে জনগণের মনে যখন বৈপ্লবিক চেতনার স্ফুলিঙ্গ এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের রূপ নিচ্ছিল, তখন বাংলা নাটকও তার স্বাক্ষর বহনে তৎপর হয়ে উঠল। যার ফলে বাংলা নাট্য ধারায় দিক পরিবর্তন ও ভাবনাচিন্তার উন্মেষ ঘটল। যেখানে যন্ত্রণাজর্জর, শৃঙ্খলাবিমুখ-জীবনধারণের গ্লানি ও সঙ্গে সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রতিপত্তি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর ঠিক তার বিপরীতে ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির চিত্রগুলি বাংলা নাটকের আঙিনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠল। "আর বিশেষ ভাবাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে এদের নাটকে সাংগঠনিক দায়িত্ব কাজ করল অনেক বেশি এবং চিন্তায় নতুনত্ব দেখা দিল অনেক দিক দিয়ে। কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী মানুষের কথা এল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে সমষ্টিসত্তা এল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থা, কর্মে আবেগ প্রাধান্যের চেয়ে বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহার, শোষক ও শোষিতের শ্রেণি নির্দেশ, নাটকে এক নায়কের প্রাধান্যের পরিবর্তে শোষিত শ্রেণিকেই নায়ক করা, সমাজ ব্যবস্থা ও শাসনযন্ত্রকে খলনায়করূপে চিহ্নিত করা এগুলি স্বাভাবতই নাটকে গৃহীত হল।"[১] তারই ফসলস্বরূপ গণনাট্য ও নবনাট্য সঙ্ঘের আবির্ভাব।

বাংলা নাটকের দরবারে এই যে বিপুল পরিবর্তন তা নির্দেশ করতে গিয়ে, এর ভিত্তি সংস্থাপনা করা প্রয়োজন- সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে যখন ব্যবহার করে আসছিল, এমতাবস্থায় গান্ধিজীর ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলন নাট্যমঞ্চে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছিল বাংলার

নাট্যচিন্তনে ও এর গতিবিধিতে। সেই আন্দোলনের (আইন- অমান্য) দিকটির কথা ভেবে "নাট্যকারেরাও অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেন দেখাত্মবোধের আবেগকে নাটকে ধরে দিতে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে উপচিত দেশপ্রেমের আবেগ মুক্তিপথ পেয়েছিল প্রধানতঃ ঐতিহাসিক নাটককে অবলম্বন করে।"[২] উল্লেখ্য যে এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটকসমূহ বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। তাছাড়া পৌরাণিক তথা ছদ্মপৌরাণিক নাটক সমূহও সে সময় দেশাত্মবোধের জোড়ালো প্রকাশ ঘটিয়েছিল তার কাহিনি বিন্যাসে, মন্মথ রায়ের 'কারাগার' (১৯৩০) নাটকটি এই পর্যায়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। উক্ত নাটকে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যে মানবিক মূল্যবোধগুলি কীভাবে মানুষ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে খোঁয়াতে বসেছে এবং এর দ্বারা মানুষ কীভাবে অপসৃত হচ্ছে তার সমাজ চিন্তার গতি প্রকৃতিতে। তবে ১৯৩০ এর অনেক আগেই অপেশাদারী নাট্যশালা সামাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এক সাংগঠনিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যদিও খুবই মন্থরগতিতে। এই চিন্তনের সূত্রপাত ঘটে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আদর্শের ফলে। সমাজের অত্যাচার, অবিচারের ছবি যখন সাহিত্যিকদের লেখনী মুখে ফুটে উঠল, তখন সেগুলো দমনের জন্য ফ্যাসিস্টরা বার্লিণ বোয়ারের বহ্নিৎসবে তৎকালীন সমস্যা ফুটে ওঠা সেই লেখা গুলো পুড়িয়ে দেয়। এনিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী আদর্শ গড়ে উঠে এবং নানা সংঘের সৃষ্টি হয়।

সে সূত্রেই এল গণনাট্য সংঘ (জনগণের জন্য) যার প্রথম পর্যায় ১৯৪০-১৯৪৩ হয়ে তার রেশ চলল ১৯৫২ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৫২-১৯৬২ হয়ে ১৯৬৭ অবধি আর তৃতীয় পর্যায় ১৯৬৭ থেকে আজ অবধি (উল্লেখনীয় যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়টিই নবনাট্য নামে অভিহিত)। গণনাট্যের এই তিনটি পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন নামে নাট্যসংস্থা গড়লেও এর শেকড় গণনাট্যের সংগেই যুক্ত। তবে নবনাট্যে মানুষ আরো আশাবাদী, নতুন প্রাণের স্পন্দনে জেনে উঠল। উল্লেখ্য 'নীলরক্ত' ও 'নীলকণ্ঠ' নাটক দুটিও সেই ভাবাদশেই লিখিত দুই ভিন্ন আঙ্গিকের নাটক সুষ্ঠু পর্যালোচনার দ্বারা নবনাট্যের ধারায় নাটক দুটির অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে।

"নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার"।[৩] 'থিয়েটার-ওয়ালা' 'উৎপল দত্ত' এই সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর নাটকগুলোতে। চোখের সামনে ভাগ্যের ছিনিমিনি খেলায় সাধারণ মানুষের জীবন এক সময় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল ভারতের মাটিতে তারই বাস্তবচিত্র ফুটে উঠতে দেখি উৎপল দত্তের 'নীলরক্ত' নাটকে। বাংলার কৃষকদের হাসিমাখা মুখে কীভাবে একদিন রক্তের কান্না ঝরে পড়ছিল তারই কিছু মর্মান্তিক চিত্র আমরা দেখতে পাই এই নাটকে। নীলচাষকে কেন্দ্র করে এই নাটক। গ্রামের নাম আসাননগর দৈনন্দিনের কর্ম ও লোকাচারে ব্যস্ত এক গ্রাম। সরলতাই যাদের সম্পদ, সততাই যাদের অহংকার। কিন্তু ব্রিটিশের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই কোথায়? জীবন নিয়ে খেলা করা যে তাদের অভ্যেস। আসলে তার জন্য প্রকৃত দায়ী স্বদেশী রক্তই অর্থাৎ জমিদার। জমিদারী শাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করে অবাধ নিষ্ঠুরতায় সামন্ত তান্ত্রিক শাসন চালু করল ব্রিটিশের হাত ধরে। 'নীলরক্ত' নাটকে এমনই এক জমিদার হল রামরাম মুখুজ্যে। ধানচাষ করে আসান নগরের সর্দার মেঘাই আর বাকি চাষীরা বেশ সুখেই দিন যাপন করছিল, কিন্তু ভিন দেশী যে দেশের সম্রাট সেখানে সুখ যে স্থাবর নয়। তাদের জীবনে বিষাদের পাহাড় হানল তখন, রামরাম, নীলকর হাউড ও লারমুরের হাতে যখন এই গ্রাম সঁপে দেয়। বাংলাদেশে এ নতুন কথা নয়, ভারতীয়দের বেগাড় খাঁটিয়ে তাদের রক্ত জল করে নীল চাষ করানো হত, কিন্তু ভাগীধার ভারতীয়রা নয়- এর মালিকানা গ্রহণ করত সেই ব্রিটিশ শাসকরাই।

ব্রিটিশের এহেন অত্যাচারে সারাদেশ উত্তাল, চাষীরা না খেয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, নিজের সন্তানকে হারিয়েছে, হাজার হাজার পরিবার ছারখার হয়েছে, তথাপি শোষণের নিবৃত্তি নেই। সমস্ত গ্রামবাসীর রক্ত ঝরেছে নীল রং হয়ে ফোঁটা ফোঁটা ধরে, অথচ সর্বহারারা নিরুপায়। নাটকে ইসুব বলেছে- "ঐ শয়তানরা সাতসাগর পেরিয়ে এসে যারা লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সর্বত্র"[৪] – অস্ত্রের আঘাতে ও মানসিক বলে ভারতভূমি তখন পঙ্গু। এদের বিষনিশ্বাস যেদিকেই পড়েছে সেদিকেই সমস্ত গ্রাস করেছে, নিজভূমিতেই সবে হয়েছে পরবাসী। যেখানে সন্তানের সামনে মাকে হতে হয়েছে বিবস্ত্রা, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে হতে হল ধর্ষিতা। কখনও সন্তানের মৃতদেহ

মায়ের কাছে এসে পৌঁছালো। হয়তো এই যে অত্যাচার তারা তাদের প্রয়োজনের তাগিদেই করত, মানুষের মনে ব্রিটিশের সন্ত্রাসকে বজিয়ে রাখার জন্য। আবার কখনও এগুলো হত তাদের পাশবিক উন্মাদনা প্রকাশের মাধ্যমে। হয় কথার চাতুরিতে, না হলে শারীরিক বলে ভারতীয়রা হয়েছিল তাদের ক্রীতদাস। নিজস্ব জমি হয়েও ছলে বলে মালিকানা গ্রহণ করে ব্রিটিশরাজ বোঝা এমনভাবে চাঁপিয়ে দিত যে চাষীদের উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব ছিল। নাটকে আমরা দেখি সাদা কাগজে এই নিরক্ষর চাষীদের 'টিপসই' দিতে বাধ্য করে তাদের জীবনকে হস্তান্তর করে প্রভুত্ব অর্জন করল লারমুর। এর কিছু দৃষ্টান্ত নাটকেই রয়েছে-

"লারমুর: দাদন নিলেই গরু ফেরত দিতাম। তা নিবেই না যখন, গরুই লাভ। চালুন.... আমিও তাই বলি উপায় আর নেই খাতা খুলুন, টিপসই নিন। ...

মেঘাই: এ কি সাদা কাগজে সই দিতে হবে?
হারাণ: হ্যাঁ ওটাই নিয়ম, নিয়ম ওটাই, ওটাই প্রচলিত নিয়ম। পরে আমরা লিখে নিব।...
দশানন: জমিদারের খেলা বুঝতে পারেনি মানুষ এমন খল হতে পারে?
মাণিক: দাসখত। দাসখতে বাঁধা পড়লাম।" [৫]

এভাবে সাদা কাগজে নেওয়া 'টিপসই' এ তাদের পরবর্তী দাসত্বের মাপকাঠি নির্ধারণ করত। এই সাদা কাগজের বলেই বিদেশী ভাগ্য দেবতারা এই দেশের চাষীদের নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য নির্ধারণ করতেন। এই চক্রান্ত থেকে বাঁচার একটি মাত্র উপায় - মৃত্যু, নাহলে বশ্যতা স্বীকার করে সারা জীবনের জন্য ক্রীতদাসের বৃত্তি গ্রহণ করা। বাংলার ভূমিতে পা রেখেই তার সন্তানদের যে উপদ্রবের চাবুক চালিয়েছিল তা কখনই ভোলার নয়, অথচ জমিদাররা, ইজারাদাররা এক্ষেত্রে নিশ্চুপ। ব্রিটিশেরে উচ্ছিষ্ট দ্বারা পালিত এই পশুরা, ভারতবাসীর নিংড়ে নেওয়া রক্তকে নিজেদের প্রসাধনের উপায় বলে মনে করত- অথচ সাধারণ মানুষ! 'উপদ্রব' শব্দটাই যেন তাদের অজানা। এই চিত্র ধরা পড়ে প্রণতি চক্রবর্তীর লেখনী মুখে- "উপদ্রব শব্দটির রূঢ়তা আমাদের শিষ্ট মনকে কুঁকড়ে দেয়- কিন্তু কি করার ছিল সেদিনের মানুষের?" [৬] বিবেকানন্দের ভাষায় "ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলেছে, নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে, লুটে নিয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা আর তার ফলে পরে রয়েছে শ্মশানের মত আমাদের দেশ।" [৭] নবনাট্যের ধারায় সংশ্লিষ্ট নাটকসমূহে সমাজের প্রতি অত্যাচারকে তার বুকের মধ্যে ধারণ করেছে এবং গণজাগরণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উক্ত নাটকে বর্ণিত কাহিনি কেবল একটি গ্রাম অথবা মুষ্টিমেয় মানুষের অত্যাচারের বার্তা বহন করছে না, বরং ব্রিটিশ নামক দস্যুদলের কাছে যে সে সময় ভারতের প্রতিটি প্রান্তের গৃহস্থের মেয়েরা ধর্ষিত হয়েছে, তাদের জৈবিক ক্ষুধার স্বীকার কোনো স্ত্রী, কোনো প্রেমিকা অথবা কারো একমাত্র কন্যাকে হতে হয়েছে। এই দস্যুদের প্রতিদিন রাতের ভোগের সামগ্রী যে ভারতীয় মেয়েদের হতে হয়েছিল- আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ব্রিটিশদের এই খাদ্যের যোগান দিত ভারতীয়রাই সামান্য কিছু উপহারের তাগিদে অথবা বাধ্যতা বশত। নাটকে হরিও এই হীন কার্য করতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু একদিন তার একমাত্র কন্যাকেও যখন সেই পশুদের রাতের খাবার হতে হয়েছিল- তখন ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে স্বদেশীদের কাছেই ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে।

শুধু কি তাই! তাদের (ব্রিটিশদের) কথার খেলাফ হলে দুর্বলতার জায়গাটিতে ধরে এমনভাবে তাদের বিনষ্ট করত যে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস কারো ছিল না। গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেবার জন্য বিধবা বিন্দুর একমাত্র সম্বল নিষ্পাপ ছেলেটি বিশুকে পর্যন্ত মৃত্যুর দরজায় নিক্ষেপ করল তারা। এ যেন-

"বাসুকীর ফণাশীর্ষে ধরণী সে বিষ-দীপ্তা নীলা,
কবিতা মুগ্ধ করে সত্য, তবু দগ্ধ করা সেই তার লীলা,
কালকূট বহ্নি তেজে মহাকাশ দগ্ধ হয়ে যায়,
মুক্তির মরীচিকা তীর্থ কলুতপ্ত মরুভূমি প্রায়।" [৮]

অত্যাচার যখন নিজ সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন শুরু হয় বিদ্রোহ। অত্যাচারের বোঝা যখন আকাশে পাড়ি দেয় সেখান থেকেই উঠে আসে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তীব্র শক্তি। আর 'নীলরক্ত' নাটকে এই আগুনের স্ফূলিঙ্গ ছিল 'ইসব'। "হাউড" (নাটকের ইংরাজ চরিত্র) এর ভাষায়- "ইসব বিশ্বাস শুধু একটা লোক নয়, মানুষ নয়। সে একটা আইডিয়া একটা আগুনের শিখা- একটা বিপজ্জনক চিন্তাধারা।"[৯] তাই লারমুর চাইছিল তাকে দমন করতে। মেঘাই সর্দার এই স্ফূরণকে বুঝতে পেরেছিলেন, বুঝেছিলেন যে একদিন এটিই আগ্নেয়গিরির আকার ধারণ করে বাংলার মাটিকে রক্ষা করবে। তাই 'বিশু' নামের শিশুটির হত্যার বিনিময়েও তিনি একদিন ইসবের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। পরে এই ইসবই- চৌগাছা, বাঁশবেড়া, ঝিনাইদহ প্রভৃতি নানা গ্রামে বিদ্রোহের মন্ত্রে মাতিয়ে এসেছিল সকলকে। 'সমাজতান্ত্রিক রদবদলের সেই দিনে আসরে সবাই ছিল, সবাই বসতো। যুগ চেতনার সেই হ্লাদিনী শক্তির মানস সরোবরে গণ্ডুষে জল পান করতে যেমন আসতেন তদানীন্তকালীন সাংস্কৃতিক জগতের দিক পালগণ, তেমনি আসতো যুবা, হয়তো বা নিষ্ফলভাবেই মাথা কুটতে।"[১০] আসান নগরেও মেঘাই সর্দার মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন- তাঁর সঙ্গ দিয়েছিল তাজু, ত্রৈলোক্য ও গ্রামের অন্যান্য যুবকেরাও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু সর্দারের পালিত পুত্র মাণিক সে যে ভিন গ্রামের সর্দার। তাই নিজ গ্রামকে বাঁচাবার তাগিদে সে ব্রিটিশের সহকারী হয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল আসান নগরে কাটানো দিনের স্মৃতিগুলো, হাসিমাখা মুখের লাবণ্যকে। কিন্তু মেঘাই সর্দার আসান নগরের মুক্তিতে নিজ স্নেহের জায়গাটি পর্যন্ত মুছে ফেলেন। বিশ্বাসঘাতককে তিনি মাফ করেননি, শেষে নিজ পুত্রকে হত্যা করে নিজের প্রাণকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেন তিনি। মেঘাই মরে যান, কিন্তু মরতে মরতে তাঁর শেষ উক্তিতেই নাটকের মূল সুর ফুটে উঠেছে-

"তোদের গর্ভে জন্ম নিক যোদ্ধা-বীর-শহীদ। ফিরিঙ্গি দস্যুদের রক্তে দাওয়া নিকিয়ে - ধান তোল ঘরে ঘরে!- ইংরেজের রক্তে- পূজো কর দেশমাতার। আমার দেশ হার মানতে জানে না।"[১১] নবনাট্যের মূল বক্তব্যই ছিল নব প্রেরণায় গণচেতনাকে জাগিয়ে তোলা, মেঘাইয়ের শেষ উক্তিটি এই বার্তারই বাহক। তাই চরম দুঃখের দিনেও গ্রামবাসীরা প্রকৃত নেতাকে চিনতে ভুল করেননি। মেঘাই যে বিদ্রোহের বীজ বপন করে গেছেন, মেঘাই এর করুণ মৃত্যুতেও- "ফাঁসের মধ্যে গোঁজা দণ্ড ঘোরানো হয়- চামড়ার রজ্জু ক্রমশঃ তীব্র আলিঙ্গন করেছে মেঘাইয়ের গলা"[১২] সেই বিদ্রোহ থেমে থাকে নি, তাঁর বিদ্রোহের উপ্ত বীজের লেলীহান শিখাই বিশাল আগুনের রূপ ধারণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একদিন ধুলিসাৎ করবে তারই ইঙ্গিত বহন করেছে মেঘাইয়ের শেষ পরিণতিতে।

"মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াই এর সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে এক সূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গণনাট্যের মর্মকথা।"[১৩] কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘে জড়িত সমিতির মানুষদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভারসাম্য রক্ষা না করতে পারায় নাট্যধারার পথ অন্যদিকে নির্ণয় করতে হল। এরসঙ্গে জড়িত তৃপ্তিমিত্রের ব্যক্তিগত অনুভূতিটি প্রকাশ করেছেন তাঁর লেখনী মুখে। যা পক্ষান্তরে গণনাট্যে সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি শিল্পীর মনোভাবটি প্রকাশ করেছে- "যে আদর্শের জন্যে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, গণনাট্য সংঘে আমরা তার সার্থকতা লাভ করতে পারিনি, কিন্তু সেই ইচ্ছাটাতো মরে যায় না। তখন যে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ ভাল করে সুস্থ পরিবেশে নাটক করার জন্য উন্মুখ। নাটক যে আমাদের করতেই হবে।"[১৪] ফলে গণনাট্যের ভাবধারাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন প্রাণের স্পন্দনে নবনাট্যের সূচনা হল। যেখানে মানুষ আশাবাদী। তাই মৃত্যু পথযাত্রী মেঘাই ব্রিটিশ থেকে ভারত বাতার রক্ষার এক বার্তা দিয়ে গেলেন।

এবার 'নীলকণ্ঠ' (প্রথম প্রকাশ - ১৯৬১) নাটকের কথা বলা যেতে পারে। নবনাট্যের ধারায় এ এক নতুন সংযোজন- যাকে আমরা একাঙ্ক নাটক নামে জানি। একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে মেটারলিঙ্ক বলেছিলেন- "A deeper, more human, more universal life"[১৫] মানুষের ছদ্ম সততার আড়ালে অসহায় মানুষের দৈনন্দিন যাত্রার এক রূপচিত্র বলা যেতে পারে এই নাটককে। উক্ত নাটকটি (নীলকণ্ঠ) একটি সামাজিক একাঙ্ক নাটক। কোনো গূঢ় সামাজিক সমস্যা এতে নেই, তবে রয়েছে অমানবিকতার পরিচয়, নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যে আধুনিক সমাজ

তার 'চাকচিকের' আড়ালে মানবিক মূল্যবোধগুলির কীভাবে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। সমাজের রূঢ়তা, তার কলুষিত রূপটিকে ফুটিয়ে মানবাত্মার জয়গানই নবনাট্যের উদ্দেশ্য ছিল, তবে এই নাটকে উৎপল দত্ত মানবাত্মার নিম্নগামী ক্রিয়াকলাপকেই প্রস্ফূটিত করেছেন।

এক ভিন্ন আদলের, ভিন্ন সুর বহন করছে উৎপল দত্তের 'নীলকণ্ঠ' নামক একাঙ্কিকাটি। বিজ্ঞানাশ্রয়ী শিল্পচিন্তা আর যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে রোমান্টিক ভাব-বিলাসিতার পরিবর্তে বস্তুতান্ত্রিক জীবনাদর্শ হয়েছে নাট্যকারদের জীবনদর্শনের মাধ্যম। উৎপল দত্তের 'নীলকণ্ঠ' নাটকটি সেই যুক্তিবাদী চিন্তারই এক ভিন্ন ফসল।

রাজপথের ম্যানহোলের অন্ধকার গর্তে অসহায়ভাবে আটকে পড়া এক ধাঙর ছেলের উদ্ধার করাকে কেন্দ্র করে তথাকথিত ভদ্র, বাবু পাড়ার কৌতুহলী অমানবিক আচরণ নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ কৌতুকের সঙ্গে আজকের সমাজচেতনার যুগের সত্যকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। আধুনিক এই নাটকটি নাট্যকারের নাট্য তালিকা পুঞ্জির এক মাইলস্টোন হয়ে দেখা দিয়েছে। অভিনব আঙ্গিকের সাহায্যে আধুনিক জীবন স্রোতের চপল গতিরঙ্গকে শেষের অশ্রুসিক্ত পরিণতিতে ফুটিয়ে তোলার এক সামগ্রিক প্রয়াস আমরা দেখি নাটকে।

হরিজন-মেথর-মুচি, যাদের কাছেও ঘেষতে চায় না, প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের সঙ্গে যা একটু সম্পর্ক, তা ফুরিয়ে গেলে সম্পর্কের কথা তো দূরে থাক, তাদের কাছ দিয়ে যেতে ও যেন গা শিউরে উঠে। এমনই এক হরিজন- এক বালক, কলকাতার ভূ-গর্ভস্থঃ প্রয়ঃ প্রণালী পরিষ্কারের ভার পড়েছে তার উপর, শিউনন্দন (নাটকরে এক চরিত্র, বাবু সমাজের এক ভদ্র বাসিন্দা) তাকে মেথরটিকে, নিয়ে আসে ম্যানহোলের কাছে। পারিপার্শ্বের সকলে নিজ কাজে ব্যস্ত। এমন সময় এক ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সেই বালকটি (হরিজন / মেথর) ম্যানহোলে পড়ে যাওয়ায় হইচই বেঁধে গেল। কিন্তু এই যে কোলাহল তা একটি প্রাণকে বাঁচাবার তাগিদে নয়- মনোরঞ্জনের একটি দৃশ্য দেখার তাগিদেই যতসব ভীড় আর হইচইয়ের সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু সেই নিষ্পাপ বালক রাজপথের ম্যানহোলের অন্ধকার গর্তে অসহায় ভাবে পড়েছিল। অথচ তাকে উদ্ধার করার মত কেউ ছিল না। কারণ সে যে 'অচ্ছুত'। বিংশ শতাব্দীতে এসে মহানগরীর আধুনিকতায় অমানবিক আচরণের প্রকাশ পাই উক্ত নাটকটিতে। যাদের কাছে সময়ের মূল্য অনেক, হয়তো বা একটি প্রাণের চেয়েও বেশি।

পারিপার্শ্বের ঝাঁঝালো আলোকে যে কলকাতা হয়তো বা তার মনুষ্যত্বেও বিসর্জন দিয়েছে। ব্যস্ত জীবনে মানুষের প্রাণের খেলাও তাদের বিনোদনের মাধ্যম। তাই যখন ম্যানহোলের অস্ফুট অন্ধকার থেকে সেই বালকটির অস্ফুট গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে সে অবস্থাতেও তাদের মধ্যে হাস্যরস জমে উঠতে দেখি-

> *"ছেলেরা: শুয়ে আছে কাদায়-*
> *ওটা হাত, এটা পা-*
> *- ঐ যে মাথা*
> *- দূর ওটা পাছা, মাথা ঐ দিকে।"*[১৬]

এভাবে একের পর এক ভিড় জমে, চায়ের কাপ হাতে কেউ বেরিয়ে আসে, মহানগরীর অর্থহীন ব্যস্ততার ছাপ নিয়ে, কেউ পোর্টফোলিও নিয়ে, কেউ চানা ভাজা হাতে- একটি প্রাণ কীভাবে নিস্তেজ হয়ে যায় সেই দৃশ্য উপভোগ করতে, আবার এদিকে আফিস ফেরত ভদ্রলোকেরা জলখাবার না খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। উপদেশের ছড়াছড়ি, কিন্তু কার্যে পরিণত করার তাগিদ কারো নেই।

এই দুর্ঘটনা আবার অনেকের ব্যবসার মাধ্যম হয়ে উঠল। সাংবাদিকরা নতুন খোরাক পেল, চায়ের দোকান অপ্রত্যাশিত ভাবে নতুন নতুন খদ্দের পেল। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে লাগল আর এই নিঃস্বপ্রাণ ক্ষুদ্র দেহটি ত্যাগ করল। নাটকের শেষে দেখি- "ফ্ল্যাশ বালব বিদ্যুৎ হানল, এমনি সময়ে ম্যানহোল থেকে একটা কাতরোক্তি

উত্থিত হতে সবাই থেমে গেল এবং ভীড়ের মধ্যে গুঞ্জন ছড়াতে লাগল। ... দমকলের ঘন্টাও শোনা গেল সেই সঙ্গে। দমকলের কর্মীরা যখন কর্দমাক্ত বীভৎস শীর্ণ দেহখানা তুলে আনল, তখন মহারাজ মরে গেছে। চোখদুটো খোলা, সাদা আর মুখখানা হাঁ কারা। নিঃশ্বাস নিতে প্রাণপনে চেষ্টা করেছিল মহারাজ কারণ মানুষ মরতে চায় না।"[১৭]

বৈজ্ঞানিক সভ্যতা কীভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে নিংড়ে মমতা, আবেগের জায়গাটিকে ধূলিসাৎ করে এক যন্ত্রে পরিণত করেছে তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এই নাটক। পুষ্পেন্দুশেখর গিরির ভাষায় সমাজের এই দিকটি আরো স্পষ্ট- "নগরকেন্দ্রিক নব্য ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিনে দিনে দেখা দেয় লোভ- লালসা আর অসংযম। এইসব সংক্রামক রোগের তীব্র বিষক্রিয়া মানবমনের গহীনে গোপনে ধীরে হলেও শিকড় চালায়। ফলস্বরূপ মানুষের মানুষত্ব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।"[১৮] যেখানে স্বার্থ নেই, সেখানে মমতাবোধও নেই। আত্মপ্রলোভনে মগ্ন এই সমাজ যে আজ তার ভোগ আকাঙ্খার অট্টালিকার পর্বতকে চুম্বন করতে চলেছে। এই হল আজকের বাস্তবতা, যেখানে স্বর্গও আত্মগ্লানিতে মগ্ন। তাই কবি লিখেছেন-

"Modern life
With its stick hurry, its divided aims,
Its heads overtax'd its plaised hearts,
Glance and nod bustle by
And never once our possessor
Soul, Before die."[১৯]

ভিন্ন আদলের, ভিন্ন মননের দুই নাটক, একটিতে বিদেশী শাসনের দ্বারা নীপিড়িত সমাজ-নতুন উদ্যমে বেরিয়ে আসতে শিখেছে অত্যাচরের শৃঙ্খলকে ভেদ করতে শিখেছে আধুনিকতাকে বরণ করে নিতে। আর পরবর্তী নাটকে সেই আধুনিকতাই প্রাণ নিতে শেখাচ্ছে নিজ স্বদেশীদেরই- ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বিষময় রূপটিকে দৃষ্টিনন্দন রূপ দিয়েছেন নাট্যকার। একটিতে মানবাধিকার লাভের লড়াই, আরেকটিতে মানবাধিকার লাভের পরবর্তীতে যে বিচ্ছিন্নরূপটি তার প্রকাশ পেয়েছে। যা নবনাট্যের ধারায় দুই বলিষ্ঠ উদাহরণ বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১। চৌধুরী, দর্শন, 'গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়', কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, মে ১৯৮২, পৃঃ ১
২। দাস, পুলিন, 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (১৯২৯-১৯৭২)], কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২য় সং, ভাদ্র, ১৩৯৮, পৃঃ ৫
৩। চৌধুরী, দর্শন, 'থিয়েটার উৎপল দত্ত', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১ম সং ১০ অক্টোবর, ২০০৭, পৃঃ ১
৪। দত্ত, উৎপল, 'উৎপল দত্ত সমগ্র', ৫ম খণ্ড, নীলরক্ত নাটক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃঃ ১০০।
৫। তদেব, পৃঃ ১০৮।
৬। চক্রবর্তী, প্রণতি, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মন্বন্তর ও দেশভাগ, বাংলা কথাসাহিত্যে তার চিত্ররূপ', কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ১৯৮১, পৃঃ ১৩১৬।
৭। বিবেকানন্দ, স্বামী, 'বাণী সঞ্চয়ণ', কলকাতা, অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণদল, ২য় সং ১৯৩৯, পৃঃ ২৩।
৮। উল্লিখিত, সংবাদ সাময়িক পত্রে ঊনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, কলকাতা, ১ম সংখ্যা, ৪র্থ সপ্তাহ, সুলভ সমাচার, ১৯৬৮।

৯। দত্ত, উৎপ্ 'উৎপল দত্ত সমগ্র', ৫ম খণ্ড, নীলরক্ত নাটক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃঃ ১০৯।

১০। ভট্টাচার্য, বিজন, উল্লিখিত মজুমদার, দেবাশিস ও সমাদ্দার, শেখর (সম্পা), 'শতাব্দীর নাট্যচিন্তা (গিরিশচন্দ্র থেকে উৎপল দত্ত)', কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৭ মার্য পৃঃ ৩৫২

১১। দত্ত, উৎপল, 'উৎপল দত্ত সমগ্র', ৫ম খণ্ড, নীলরক্ত নাটক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৭, পৃঃ ১৬০।

১২। তদেব।

১৩। মজুমদার, দেবাশিস ও সমাদ্দার, শেখর (সম্পা), 'শতাব্দীর নাট্যচিন্তা (গিরিশচন্দ্র থেকে উৎপল দত্ত)', কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৭ মার্চ, ২০০০, পৃঃ ৩৪৭।

১৪। তদেব, পৃঃ ৩৭৬।

১৫। Materlinck, M, 'The Irogical in Daily Life', https://www.prtar.org/stable/27530556.

১৬। দত্ত, উৎপল, 'উৎপল দত্ত সমগ্র', ২য় খণ্ড, নীলকণ্ঠ নাটক, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ৩য় মুদ্রণ, জুলাই, ২০০৭, পৃঃ ৫২২।

১৭। তদেব, পৃঃ ৫২৪।

১৮। দাস, পুলিন, 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (১৯২৯-১৯৭২) পৃঃ ৯

১৯। উল্লিখিত, সাহা, দিলীপ, 'গণনাট্য আন্দোলন সমকাল ও প্রেক্ষিতে', কলকাতা, ৪ই মার্চ, ১৯৯৩, পৃঃ ৫৭।